Ri
163

বাংলা মায়ের শহীদ ছেলে

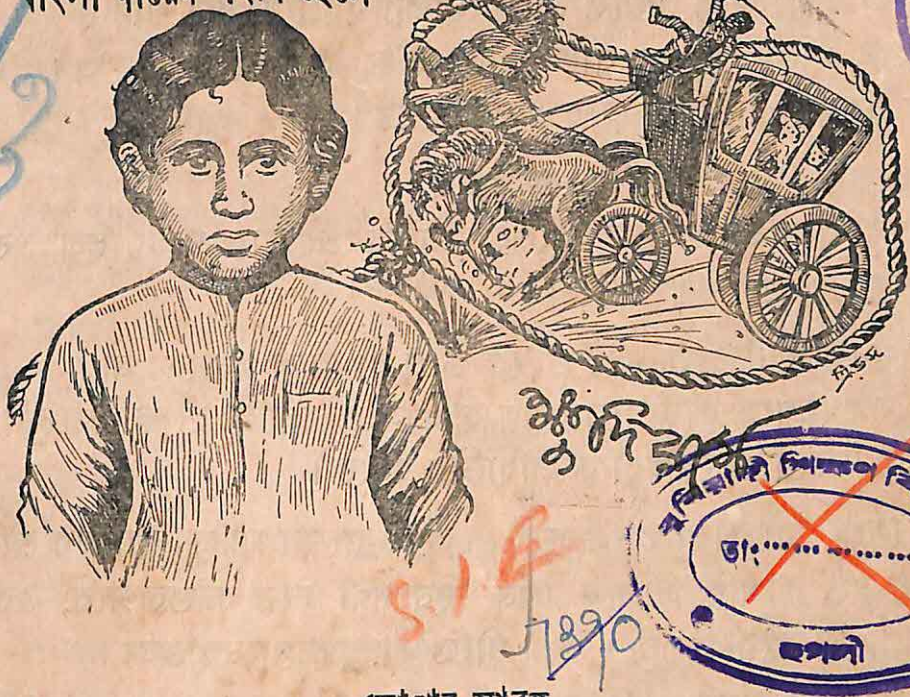

জোয়ার আরম্ভ

১৯২৬ সাল, ১৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

ইংরেজী ১৮৮৯ সাল, ৩রা ডিসেম্বর, সন্ধ্যা তখন ৫টা।

মেদিনীপুর জেলার হবিবপুরের ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে জন্ম হ'ল একটী ছেলের। কত ছেলেই তো জন্মে, সব ছেলে এ ছেলের মত হয় না।

পিতা নাড়াজোলের তহশীলদার।

মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছিলেন ধর্ম্মপরায়ণা, আদর্শ গৃহিণী।

অল্পবয়সে মরেছিল তাঁদের দু' দুটী ছেলে।

মা ছেলেকে গ্রাম্য সংস্কার অনুসারে এক মুঠো ক্ষুদের বদলে তাঁর বড় মেয়ে অপরূপা দেবীর কাছে বেচে দিলেন।

21.11.2008
13752

এই রকম করে বেচলে নাকি ছেলের পরমায়ু বেড়ে যায়।

তা' ছাড়া ছেলের নাক কান ছেঁদা করে দেওয়া হ'ল। এ-ও নাকি পরমায়ু বাড়াবার আর একটা উপায়।

ছেলের নাম রাখা হ'ল—ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম বড় হ'তে লাগ্‌লেন। তাঁর চেহারার মধ্যে ছিল একটা চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি।

যে তাঁকে দেখতো সেই তাঁ'কে ভাল না বেসে পারতো না।

যে জায়গায় ক্ষুদিরামের জন্ম হ'ল সে জায়গাটা হচ্ছে মেদিনীপুর সহরের উত্তরে, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর কাছে।

সিদ্ধেশ্বরী কালী বড় জাগ্রতা। ক্ষুদিরামের মা ক্ষুদিরামের জন্মের আগে এই কালীর সামনে তিন দিন ধর্ণা দিয়ে কাতরভাবে, একান্ত মনে প্রার্থনা করেছিলেন—একটী দীর্ঘজীবী পুত্রসন্তানের জন্য।

মায়ের দয়া হ'ল, তিনি স্বপ্নে ক্ষুদিরামের মাকে বললেন—"তোর ছেলে হবে, বেশী দিন বাঁচবে না। সে ছেলে কিন্তু মরে গেলেও এমন ভাবে সে মরবে যা'র জন্য তাঁর নাম—তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে চিরকাল।"

বেশ সুখেই চল্‌ছিল ক্ষুদিরামদের সংসার কিন্তু সুখ আর দুঃখ ঘোরে গাড়ীর চাকার মত।

বোধ হয় সে ১৩০২ সাল, ক্ষুদিরামের মা পরপারে যাত্রা করলেন।

চারমাস যেতে না যেতে ক্ষুদিরামের বাবাও চলে গেলেন।

বড়দি অপরূপা দেবী দেখা-শুনা করতে লাগলেন ক্ষুদুকে।

বড়দির বিয়ে হয়েছিল—হাটগেছে, অমৃতলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে।

অমৃত বাবু ঘাটালের সিভিল কোর্টে কাজ করতেন। শ্যালক ক্ষুদিরাম ও তাঁ'র দু'বোনকে তিনি নিয়ে গেলেন তাঁ'র বাড়ী হাটগেছে।

হাটগেছেয় ছিল এক পাঠশালা, নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে পাঠশালার গুরুমশাই।

তাঁর কাঁছে ক্ষুদু পড়তে লাগল।

অমৃত বাবু বদলী হলেন তমলুকে, ক্ষুদুও যেতে বাধ্য হ'ল তমলুকে।

এখানে আশুতোষ রায় মশাই প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, ক্ষুদু আর তাঁ'র ভাগিনেয় ললিতকে।

ক্ষুদিরামের ছাত্র-জীবনে এই ললিতই ছিল তাঁ'র একমাত্র খেলার সাথী, সকল সময়ের সঙ্গী।

ক্ষুদিরামের ছোট বোন ননীবালার বিয়ে হ'ল আনন্দপুরে, কুমুদনাথ ঘোষের সঙ্গে।

বিয়ের পর তিনি স্বামীর ঘর করতে গেলেন, ক্ষুদিরাম সকলকে ছেড়ে থাকা বড় কষ্টকর বোধ করতে লাগলেন।

ক্ষুদিরামের এ্যাড্‌ভেনচার

ক্ষুদিরামের বড়দি অপরূপা দেবী বলেছেন, ক্ষুদিরাম ছোটবেলা থেকেই ভারী একগুঁয়ে ছিল, যা' করতে চাইত তা' না করে ছাড়তো না। তাঁ'র চঞ্চলতার সীমা ছিলনা।

সবাইকে ছেড়ে থাকতে ক্ষুদিরামের বড়ই কষ্ট হ'তে লাগল।

তাই তিনি একদিন পায়ে হেঁটে আট মাইল রাস্তা পেরিয়ে গেলেন হবিবপুরের কৃত্তিবাস বসু মশাইর বাড়ী।

কৃত্তিবাস বসু মশাইর স্ত্রীকে ক্ষুদিরাম মা বলে ডাকতেন। আটদিন রইলেন সে বাড়ীতে।

কার্ত্তিক দত্ত বলে এক ভদ্রলোক আবার ক্ষুদিরামকে নিয়ে এলেন তমলুকের রামসাগর দীঘির তীরে, নন্দলাল দাসের বাড়ীতে। সেখানে অমৃত বাবু ছিলেন ভাড়াটে।

পড়া-শুনায় ক্ষুদিরাম

এখানে এনে ক্ষুদিরামকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল তমলুকে হ্যামিলটন্ স্কুলে।

ক্ষুদু পড়তে লাগলেন, এই স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া হ'ল তাঁ'র। তমলুকে ক্ষুদিরামের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন শশিভূষণ অধিকারী মশাই। এই তমলুকে জুটলো ক্ষুদিরামের বহু বাল্যবন্ধু। প্রিয়তম বন্ধু হলেন উকীল তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবার বদলী হ'লেন অমৃতবাবু। এবার গেলেন মেদিনীপুর সহরে। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল।

এ হচ্ছে ১৯০৪ সালের কথা। তা'র পর আর বেশী দিন পড়া হলো না তাঁর, এক বছর পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে উঠলেন।

অষ্টম শ্রেণীই হ'ল তাঁ'র বিদ্যার শেষ, তারপর আর তিনি পড়া-শুনা করেন নি।

কিশোর-কালের পর

ক্ষুদিরাম বড় হলেন, একটু লেখা পড়াও শিখলেন।

তাঁ'র মন ছিল বড় চঞ্চল, চঞ্চলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র সামনে উপস্থিত হ'ল সরকার-বিরোধী এক আন্দোলন।

আগু-পিছু বিবেচনা না করে ক্ষুদিরাম ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনের স্রোতে।

তাঁ'কে 'ভাল ছেলে' করবার জন্যে তাঁ'র ভগিনী ও ভগিনী-পতি বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু ক্ষুদিরাম বড় এতগুঁয়ে। কারও কথা শুনবার ছেলে তিনি নন। একেবারে উদ্ধত।

একদিন দিদি ও দাদাবাবুর নামে এক চিঠি লিখে রেখে ক্ষুদিরাম চলে গেলেন—নিরুদ্দেশের পথে।

যেতে যেতে গেলেন এক গৃহস্থের বাড়ীতে।

গৃহস্থ বড় গরীব, তার উপর বড় ব্যারাম তার। বহু পোষ্য-ও তার। ক্ষেতে যা সামান্য কিছু শস্য হয় তাই তার একমাত্র সম্বল।

তার অবস্থা দেখে ক্ষুদিরামের বড় কষ্ট হল। সে সেই বাড়ীতে থেকে রুগ্ন গৃহস্থের কথা মত তার হাল দিতে লাগলেন, জমি নিড়াতে লাগলেন।

কোন দিন নেই ওসব কাজের অভ্যাস তাঁ'র। শরীরের নানা জায়গা কেটে গেল ; বহু জায়গা উঠল ফুলে।

সেই অবস্থায় ক্ষুদিরাম একদিন রাত্রে ফিরে গেলেন তাঁর বড়দির কাছে।

বড়দি অনেক দুঃখ করলেন। দুষ্টুমি ছেড়ে পড়াশুনো করে ভাল হতে কতই অনুরোধ করিলেন! কিন্তু ওসব করতে ক্ষুদিরাম তো আসেন নি।

তাঁ'র যা' কাজ তাই তিনি নিলেন বেছে।

স্নেহময়ী দিদি বলিলে কি হ'বে? ক্ষুদিরাম হয়ে উঠলেন অন্য রকম। পড়াশুনা তো করলেনই না—পড়তে লাগলেন গীতা, চণ্ডী, বড় বড় লোকদের জীবনী, আর স্বদেশী কথায় ভরা সব বই।

যোগ দিলেন মেদিনীপুরের তখনকার চারটে আখড়ায়। এই সব আখড়ায় শেখানো হ'তো ডন, কুস্তি, প্যারালেল বার, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, আরও অনেক রকমের সব কসরৎ।

স্বাস্থ্য ক্ষুদিরামের বড় ভাল ছিল। গায়ে ছিল তাঁ'র অসুরের মত বল। লোহার মত শক্ত ছিল তাঁ'র দেহের গঠন।

অতি সহজেই ঐ সব শিখে, ক্ষুদিরাম শহরের বাইরে যে সব সমিতি ছিল সেখানে গিয়ে ছেলেদের ঐ সব খেলা শেখাতে লাগলেন। বেশ নাম হ'ল তাঁ'র, সকলের সঙ্গেই খুব মেলামেশা করায় সকলেই তাঁকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতো। তাঁ'র কথা বহুলোকে শুনতো।

সময়ও এল তাঁ'র—মনের ভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী।

এ হচ্ছে ৪৩ বছর আগেকার মেদিনীপুরের কথা।

স্বদেশী যুগ

তখন স্বদেশী-যুগ। ছেলেরা সব দলে দলে দেশী কাপড় বেচে, দেশী জিনিষ চালাতে চেষ্টা করে। বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলে, বিলাতী জিনিষ যে সব দোকানে বেচে, সে সব দোকানের সামনে বসে থেকে খদ্দেরের বিলেতী কাপড় কিনতে মানা করে।

ইংরেজীতে একেই বলে পিকেটিং।

ক্ষুদিরাম ছিলেন অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। রোদ-বৃষ্টি কিছুতে তিনি কাবু হতেন না।

ক্ষুদিরামের বড়দি অপরূপা দেবী বলেছেন ঃ—

"আমাদের ক্ষুদুর অসুখ-বিসুখ বড় হ'তনা, স্বাস্থ্য ছিল তার অটুট। কিন্তু স্বদেশী কাজে আহার নিদ্রা ছেড়ে, রোদে রোদে ঘুরে হঠাৎ হ'ল তা'ত বড় জ্বর।

ঘন ঘন ফিট্ হ'তে লাগল জ্বরে, আমি মনে করলাম ক্ষুদুকে ভুতে ধরেছে। ভূত ছাড়াতে আনা হ'ল রোজা। রোজা ক্ষুদুকে মন্ত্র আওড়ে ঝাড়তে লাগল। ক্ষুদু বললে, "দেখ রাজা, তুমি আমার এ ভুত কি ছাড়াবে? তুমি শাদা ভুত ছাড়াতে পারো? যে ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপে আমাদের সব রক্তটুকু চুষে খাচ্ছে?"

রোজা ঝাঁড়ফুঁক ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

জ্বর ক্রমে বেড়ে চললো মেদিনীপুরের বড় ডাক্তার শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে ডাকা হ'ল। তাঁর সু-চিকিৎসায় ক্ষুদিরাম ক্রমে ভাল হয়ে উঠ্ল। ডাক্তারবাবু জ্বরের কারণ বললেন—স্বদেশী কাজে না খেয়ে দেয়ে, রোদ বৃষ্টি না মেনে ঘুরো-ঘুরি। হা'হোক ক্ষুদিরাম সেবারকার মতো বেঁচে উঠল।"

ভাবান্তর

কলেজিয়েট স্কুলে পড়বার সময়ই ক্ষুদিরামের আশ্চর্য্য ভাবান্তর দেখা দিল। তাঁ'র মনের ভাব সব বদলে গেল।

তিনি খুঁজে খুঁজে পড়তে লাগলেন পরমহংসদেবের উপদেশ, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও যেখানে যা' ভাল ভাল বই ছিল।

সেই সময়ে ১৯০৫ সালে ইংরেজরা কুমতলবে আমাদের এই বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল। বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপার নিয়ে যত সব খবরের কাগজের লেখার উপর পড়ল ক্ষুদিরামের দৃষ্টি।

ক্ষুদিরাম খবরের কাগজ পড়ে, স্বদেশী বিষয়ে লেখা জায়গাগুলি কেটে রেখে বারবার পড়তে লাগলেন। সেইগুলো হ'ল তাঁ'র একান্ত প্রিয় বস্তু।

ঘন ঘন স্বদেশী সভা হ'ত। সেই সব সভায় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি আসবাবপত্রের বন্দোবস্তের ভার নিতে লাগলেন ক্ষুদিরাম।

এ সব কাজে দেখা গেল তাঁ'র অসাধারণ উৎসাহ।

পিকেটিং

পিকেটিংয়ে ক্ষুদিরাম হ'লেন নায়ক। তিনি যে দিকে, যে সব দোকানে যেতে লাগলেন সেই সব দোকানে পিকেটিংয়ের জয় জয়কার হ'তে লাগল।

ক্ষুদিরামের ভাবান্তর হ'ল। স্বদেশীই হ'ল তাঁ'র একমাত্র কাজ। অন্য সব কাজ তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন।

খাওয়া-পরায় বা খেলা-ধূলায়ও রইল না তাঁ'র কোন আসক্তি। দিনরাত স্বদেশী—বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, অনবরত সে চেষ্টা।

ক্ষুদিরামের সাহস

শিল্প প্রদর্শনী হচ্ছে মেদিনীপুরে।

ক্ষুদিরাম বিতরণ করছেন "বন্দে-মাতরম্" খবরের কাগজ।

পুলিশ তাঁর কাজে বাধা দিল, ক্ষুদিরামের সহ্য হল না। ক্ষুদিরাম পুলিশের নাকে ঘুষি মেরে পালিয়ে গেলেন পাঁড়াগায়। সেখানে গিয়ে খোরাকীর বদলে মজুরী করে আত্মরক্ষা করলেন।

ক্ষুদিরামের আর একটী সাহসের গল্প আছে ঃ—

বিলেতী দ্রব্য বর্জ্জন চলছিল হু-হু করে।

সব দোকানের বিলেতী কাপড় ক্ষুদিরামের ভয়ে লুকিয়েছিল দোকানদারেরা,.....কিন্তু একটী দোকানদার কথা শুনলে না।

ক্ষুদিরাম এক বোতল কেরোসিন নিয়ে, দিয়াসলাই ধরিয়ে দোকানের সব কাপড় পুড়িয়ে ফেললেন।

১৯০৫ সালে মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীতে ডাক্‌ল বান, নদী-তীরের গ্রামগুলির সর্ব্বনাশ হয়ে গেল একেবারে।

ঘর গেল, বাড়ী গেল' গরু বাছুর সব গেল। চাল, ডাল, পরবার কাপড়-চোপড় কিছু রইল না।

এই খবর শুনে ক্ষুদিরাম দল বেঁধে সহরের লোকদের নিকট হ'তে অনেক কিছু আদায় করে সেই সব গ্রামে গেলেন।

সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে—কারওবা ঘর বেঁধে দিতে সাহায্য, কারও বা কাপড়-চোপড়, চাল ডাল দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন, সে কি কম পরিশ্রম!

ক্ষুদিরামের উদারতা

ক্ষুদিরাম স্বার্থপর ছিলেন না, সবকিছু ছিল তাঁর পরের জন্য—পরকে খাইয়ে তাঁর সুখ, পরকে পরিয়ে তাঁর আনন্দ।

তখন শীতের দিন। এক ভিখারী এল বস্ত্রহীন, শীতে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষুদিরামের কাছে।

তার দুর্দ্দশা দেখে ক্ষুদিরামের বড় দয়া হল, তিনি গিয়ে তাঁ'র বাবার স্মৃতিতে ভরা একখানা শাল ছিল, তাই দিয়ে ফেললেন ভিখারীকে।

দিদি বললেন, "ওকি ও শাল পড়বে ? ও বেচে ফেলবে।" ক্ষুদিরাম বললেন, "তাতেই বা দোষ কি ? তাতে তো কতকগু'লো লোকের আহার জুটবে কয়েক দিনের।"

এমনই কত উদারতা ছিল ক্ষুদিরামের, এমনই ছিল মহৎ হৃদয় তাঁর। যে দেশে বহু পুণ্যফলে এমন ছেলে জন্মে, ধন্য সে দেশে এ প্রকৃতির ছেলেরা আসে, লীলা করে, কীর্ত্তি রেখে যায়-সে দেশ সকল দেশের সেরা।

বিপ্লবী দলে ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম সুগঠিত দেহ, অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, নিতান্ত নির্ভীক, মহা সাহসী।

অত্যাচারী ইংরেজের আমলাদের মেরে দেশকে নিরাপদ করা হল ১৯০৬ হতে ১৯০৮ সালের বিপ্লবীদের সঙ্কল্প

বাছা বাছা সব ছেলে দিয়ে গড়ে তোলা হল বিপ্লবীর দল। তাদের না আছে প্রাণের ভয়, না আছে কোন আশঙ্কা।

গুপ্ত সমিতিতে ভরে গেল সারা বাংলা দেশ—বিদেশী বর্জ্জনে প্রথম চেষ্টা হল, তার পর হল—

রিভলভার দিয়ে অবিচারকদের হত্যার চেষ্টা। ইংরাজের আমলারা বড় কড়াকড়ি করতে লাগলেন

7390

দমন নীতি চালালেন সারা দেশে, তাঁদের প্রথম দৃষ্টি পড়ল ছাত্রদের উপর।

এদিকে বিপ্লবীরা চেষ্টা করতে লাগলেন নানা রকমের। হেমচন্দ্র কানুনগো গেলেন ফ্রান্সে বোমা তৈরী শিখতে। শিখে এলেন তিনি, বোমা তৈরী হতে লাগল।

বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা হল।

যুক্তি নেই, তর্ক নেই, পশুশক্তি হয়ে উঠেছিল প্রবল। কাজেই পশু-শক্তি দ্বারা তাদের সে গতি রোধ করাই হল উপযুক্ত কর্ম্ম।

ইংরেজ চালালেন নিষ্ঠুর নির্ম্মম অত্যাচার। তার মধ্যে কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংসফোর্ড একাদিক্রমে বহু দণ্ড দিলেন দেশীয় লোকদের।

সুশীল সেন বলে একটী ছেলেকে বেত মারলেন। যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি প্রভৃতির সম্পাদকদের দিলেন গুরুতর দণ্ড।

দেশের নায়ক বিপিন পালকে জেলে পুরলেন, কাজেই বিপ্লবীরা সেই দণ্ডদাতা সাহেবটীকে খুন করতে চেষ্টা করল।

কিংসফোর্ডকে খুন করতে পাকা লোক চাই। মেদিনীপুর শাখার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে আশীর্ব্বাদ করে তাঁ'রা পাঠালেন মজঃফরপুর। মজঃফরপুরে সেস্‌নজজ হয়ে গিয়েছিলেন কিংসফোর্ডসাহেব।

ক্ষুদিরাম ছদ্মনাম নিলেন দুর্গা সেন, প্রফুল্লের নাম হ'ল দীনেশ রায়। নির্ব্বাচিত মৃত্যু মন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত নির্ভীক দুই বাঙ্গালীর ছেলে যাত্রা করলেন।

মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মজঃফরপুরে এলেন। এসে উঠ্‌লেন কিশোরী

বাড়ুয্যের ধর্ম্মশালায়। পাঁচ ছ'দিন লক্ষ্য করতে লাগলেন কিংসফোর্ড সাহেবের গতিবিধি।

১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল—১৩১৫, ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—প্রফুল্ল যে বোমা নিয়ে এসেছিলেন তাই ক্ষুদিরাম নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কিংসফোর্ডের যাওয়ার পথে।

তখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে, কোনকিছু তেমন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

একখানা গাড়ী কিংসফোর্ডের বাড়ী হ'তে বের হ'ল।

গাড়ীখানি কিংসফোর্ডের কিন্তু সেদিন কিংসফোর্ড সে গাড়ীতে না গিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানকার নাম-করা ব্যারিষ্টার মিষ্টার কেনেডীর স্ত্রী ও কন্যা—ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলেন না ক্ষুদিরাম।

ভুল করে ফেললেন বোমা। সেই বোমায় পুড়ে মরল কেনেডীর স্ত্রী আর কন্যা।

বোমা ফেলেই দু'জনে ছুটে পালালেন, ভাবলেন কাজ উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভুল!

বোমা ফেলার পরদিন

ক্ষুদিরাম দৌড়ে চলে গেলেন মজঃফরপুর হ'তে ২৫ মাইল দূরে —'ওয়াইনী' ষ্টেশনে গিয়ে তিনি থামলেন।

বড় ক্ষুধা, শরীর চাচ্ছিল একটু বিশ্রাম। এতেই হ'ল তাঁ'র কাল।

ক্ষুদিরাম ভেবেছিল এতদূর তাঁ'র আর অনুসরণ করবে কে? কিন্তু সেইটেই হ'ল তাঁ'র বুদ্ধির মহাভুল।

শিউ প্রসাদ আর ফতে সিং নামক দু'জন কনেষ্টবল তাঁ'কে ধরে ফেলল।

দু'টী রিভলভার আর কতগুলো কার্ত্তুজ ছিল তাঁ'র জামার পকেটে।

তাঁকে ধ'রে নিয়ে এসে আটক করা হ'ল মজঃফরপুরের জেল-হাজতে। বিচারাধীন তিনি একমাস সাত দিন পর—

৮ই জুন তাঁর বিচার আরম্ভ হ'ল। অতিরিক্ত সেসন্ জজ্ মিঃ কারণডফের সে এজলাস, কিংসফোর্ড বড় জজ্। তাঁরই ইঙ্গিতে হয় সব বিচার।

ক্ষুদিরাম দুঃখিত চিত্তে শুনল কেনেডীর স্ত্রী ও কন্যা মরেছে তাঁর বোমায়, মরে নি কিংসফোর্ড।

দু'বার জবানবন্দী নেওয়া হ'ল ক্ষুদিরামের। অতি সরল অতি সহজ, অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ, নির্ভীক জবানবন্দী দিলেন ক্ষুদিরাম। প্রাণের ভয়ে এতটুকুও ভীত ন'ন তিনি।

সকলে শুনে অবাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে রইল, এ কিরে ছেলে, বাবা!

সেসন জজের রায়

খুব ঘটা করে বিচার হ'ল। দু' দু'জন ইউরোপীয়ান লেডীকে মেরে তা'র উপর কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য বোমা ফেলে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডের হুকুম হ'বে না—এ কেউ ভাবতেও পারে না, ভাবলেও না।

জজ্ ক্ষুদিরামকে মৃত্যুদণ্ড শুনাতে বললেন ঃ—"আপনি কি জানেন না যে আপনার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে?"

ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বললেন, "তা শুনেছি সাহেব, কিন্তু দয়া করে যদি একটা অনুমতি দেন যে আমি এই উপস্থিত লোকদের নিকট বলে যেতে পারি,—বোমা, কেমন করে তৈরী হয়, বোমা মারলে কি হয়, তাহ'লে একটা বোমার ছবি এঁকে দেখিয়ে দি।"

হাকিম শুনে আঁৎকে উঠ্‌লেন, বললেন, "কে আছ এখানে, এই সাংঘাতিক ছেলেটাকে নিয়ে যাও এখনি হাজতে।"

হাইকোর্টে ক্ষুদিরাম

সেসনে ফাঁসির হুকুম হ'ল। ক্ষুদিরামের ইচ্ছা নয় যে তাঁ'র প্রাণের জন্য ইংরেজের আদালতে সে ভিখারী হয় কিন্তু উকীল কালিদাস বাবু শেষ চেষ্টা করলেন। হাইকোর্টে আপিল হ'ল।

হাইকোর্টেও সেসনের রায় বহাল রইল, ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন ঠিক হ'ল ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮।

ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম

এল ১১ই আগষ্ট, সে হচ্ছে ৪০ বছর আগেকার কথা,—
ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন।
তখন ভোর, ক্ষুদিরামকে জেলে ফাঁসি দেওয়া হবে—
মাত্র দু'জন বাঙ্গালী দেখবে। ফাঁসির মঞ্চ আনা হ'ল জেলের ভিতর।
ক্ষুদিরাম, ফাঁসিদাতা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফাঁসির ঐ দড়িতে মোম দিয়েছ কেন? তাড়াতাড়ির জন্য বুঝি"?

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ক্ষুদিরাম মনে মনে ভাবতে লাগলেন তখন—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র—'বন্দেমাতরম'।

"সুহাসিনীং সু-মধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।"

ক্ষুদিরামের গলায় পরানো হ'ল ফাঁসির দড়ি। নীচ থেকে টেনে নেওয়া হ'ল ফাঁসির মঞ্চ।

মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে সব শেষ হয়ে গেল।

দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এ শোক সংবাদ। সবাই ভাবতে লাগল পরাধীন আমরা—তাই আমাদের এ দুর্ভাগ্য। আনতে হবে যেমন করে হোক্ স্বাধীনতা—রোধ করতে হবে এমন মহাপ্রাণদের ফাঁসি।

গেলে—তবে যাও ক্ষুদিরাম তোমার এই আত্মোৎসর্গে বাঙ্গালীর সুপ্ত চেতনা জেগে উঠুক।

একা প্রাণ দিয়ে সহস্রকে জাগিয়ে, মানুষ করে গেলে তুমি। আবার এসো—

আবার এসো তুমি ক্ষুদিরাম,
তোমার ঐ সাহস ঐ ক্ষাত্রবীর্য্য নিয়ে।

মুরিদাবাদী শিক্ষণ বিদ্যালয়
তা.....
হুগলী

—উপসংহার—

ক্ষুদিরামের এই অমর কীর্ত্তি বাঙ্গালীর এক অশিক্ষিত চারণ, অসংলগ্ন অশুদ্ধ হলেও গেঁথে রেখে গিয়েছেন তাঁর প্রাণোন্মাদী ভাব ও ভাষায়। আমরা সেই চারণকে নমস্কার করে তাঁর সেই দেশ-ভক্তির স্মৃতি-মধুর সঙ্গীতটী বাঙ্গালীর আবৃত্তি ও অনুপ্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে এই স্থলে উদ্ধৃত করি। অমর ক্ষুদিরামের অমর কাহিনী চিরকাল অমরই থাকবে।

Date 21.11.2008
Acc. No. 13752

চারণ গেয়েছেন, সে দিন কণ্ঠ তাঁর ছিল ইংরেজ আইনে রুদ্ধ, তাই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে :—

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
অভিরামের দ্বীপান্তর মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে
লাট মলো না—বিফল হলো
মলো ভারতবাসী।
দশটা বেলার ঘন্টা দিল
ফাঁসির হুকুম জারি হলো
হাসি মুখে পরব ফাঁসি
দেখবে আমার দেশবাসী।
দশ মাস দশ দিন পরে
আসবো ফিরে মাসীর ঘরে
চিনতে যদি না পারিস্ মা
চিনিস্ গলার ফাঁসি।

7390
Library

আজ বাংলা ছিন্নভিন্ন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আশীর্ব্বাদ ক'রে বাঙ্গালীকে করেন সুস্থ, স্বস্থ, উদ্যমপূর্ণ।

মহাকবির মনোমত :—

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক্, এক হউক্, হে ভগবান।"

Pa
163

জয়হিন্দ্, ভাবময়।

—শেষ—

সাহিত্য সম্রাট

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী

ডক্টর

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

ভাষা, রচনা-মাধুর্য্য ও মৌলিক ভাবধারা অক্ষুণ্ণ আছে।

- কপালকুণ্ডলা
- আনন্দমঠ
- চন্দ্রশেখর
- দেবী চৌধুরাণী
- মৃণালিনী
- সীতারাম
- কৃষ্ণকান্তের উইল
- বিষবৃক্ষ
- দুর্গেশনন্দিনী
- রাজসিংহ
- ইন্দিরা, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়
- রজনী
- কমলাকান্তের দপ্তর

ছেলেমেয়েদের উপহারের জন্য কালোপযোগী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থমালা

প্রতি খানি ১।০

এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩-১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য আট আনা মাত্র